সাম্প্রতিক কৃষি আইন

কোনও ঘটনায় দেশের সংবিধান মান্যতা না পেলে, ঘটনাটাকে কী বলা হবে? অসাংবিধানিক? সংবিধান-বিরোধী? দেশদ্রোহ? সাংবিধানিক সংকট?

ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিল তথা ২৪৬তম ধারার দ্বিতীয় তালিকা অর্থাৎ রাজ্যতালিকার ১৪তম উপধারায় বলা হচ্ছে, কৃষি, কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা, কীটদমন ও চারাগাছের রোগপ্রতিরোধ অর্থাৎ, কৃষিসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ৩০তম উপধারায় বলা হয়েছে, মহাজনি কারবার, মহাজন এবং কৃষিঋণ সহায়তা এগুলি রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। ৩২তম উপধারা অনুযায়ী, প্রথম অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ক্ষেত্রে সংস্থার নিগমভুক্তি (incorporation), নিগমবদ্ধ (corporate) সংস্থার নিয়ন্ত্রণ, সংস্থা বন্ধ হওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়; নিগমবদ্ধ নয় এমন বাণিজ্যিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য সমিতি ও সংগঠন; সমবায় সমিতি, এই সমস্তই রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং, কৃষিক্ষেত্রের বাণিজ্যকরণ, বাজার, বাজারের নিয়মাবলী প্রণয়ন এবং এই ক্ষেত্রে নিগমবদ্ধ অর্থাৎ, কর্পোরেট সংস্থার পত্তন করা বা না-করা এবং সেগুলির নিয়ন্ত্রণ রাজ্যের এখতিয়ারে পড়ে। সেক্ষেত্রে, রাজ্যগুলির সঙ্গে পরামর্শ না করা, তাদের প্রস্তাব ও প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে কৃষিক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাব্য বিপুল প্রভাবক্ষম আইন প্রণয়নের চেষ্টা কি সংবিধান-বিরোধী নয়!

এই বছর কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত, রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ গত ৫ই জুন ‘দি গেজেট অফ ইন্ডিয়া’-এর মাধ্যমে দেশে জারি ও প্রকাশিত হল। এক, অত্যাবশকীয় পণ্য (সংশোধনী) অধ্যাদেশ। দুই, কৃষক (ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা) দামের আশ্বাস ও খামার পরিষেবা চুক্তি অধ্যাদেশ। তিন, কৃষকের উৎপন্ন, কারবার ও বাণিজ্য (উন্নয়ন ও সুবিধা) অধ্যাদেশ। এরপর এগুলি আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে যথাক্রমে ১১১, ১১২ এবং ১১৩ নম্বর বিধেয়ক হিসাবে পেশ হল সংসদে। বিরোধীপক্ষের কারও কথা শোনা হল না। তাঁদের বক্তব্য রাখার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হল না। মোটের উপর, এই বিষয়ে সংসদে বিতর্কের পরিসর ও পরিবেশ দেওয়া হল না। কেন্দ্রীয়

সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি সাংসদদের দাপটে ও প্রায় গায়ের জোরে বিধেয়কগুলি সংসদে পাশ করিয়ে নিলেন। সংসদ থেকে বিরোধী দলগুলির প্রতিবাদী সাংসদদের বহিষ্কার করা হল। আহত হল গণতন্ত্র।

কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত অধ্যাদেশগুলি জারি হল ও সংসদে বিধেয়কগুলি পাশ করানো হল? যখন সারা দেশ করোনার প্রকোপে গৃহবন্দি, অর্থনীতি বিধ্বস্ত, শ্রমিকেরা কর্মহীন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ, ঠিক তখনই। এত তাড়া কীসের? অধ্যাদেশ ও বিধেয়কগুলিতে সাফাই গাইতে কোভিদ-১৯ এরও দোহাই দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এই অতিমারি ও তার জেরে লকডাউনের ফলে অর্থনীতি বিপাকে, শিল্প ও কৃষি বিপন্ন, কৃষকদের জীবিকা প্রশ্নের মুখে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তাই এখনই কৃষক ও কৃষির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কিছু সুদূরপ্রসারী আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

বক্তব্যগুলি কি পরস্পরবিরোধী নয়? কৃষি এবং কৃষকের জীবিকা বিপন্ন হলে, এখনই এই আপৎকালে কৃষকেরা কৃষিক্ষেত্রে হঠাৎ কীভাবে নতুন কোনও প্রথা বা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে তৈরি হয়ে উঠবেন! সুদূরপ্রসারী বা দীর্ঘকালীন কোনও সমাধান কি এইভাবে চটজলদি স্বল্পকালীন উদ্যোগে খুঁজে পাওয়া সম্ভব! যে আইনের ফল সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার আগে কি দেশের সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা এবং বিতর্কের প্রয়োজন থাকে না! এই সমস্ত প্রশ্ন ও ভাবনাকে গুরুত্ব না দিয়ে একতরফা আইন তৈরি করা কি স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয়? এই আইন এভাবে তৈরি করা হবে কার স্বার্থে?

কৃষকের স্বার্থে নয়। এমনকী, কৃষি-উৎপাদনের যাঁরা চূড়ান্ত ভোক্তা, তাঁদের স্বার্থেও নয়। বিধেয়কগুলি খোলা মনে পর্যালোচনা করলেই ধরা পড়ে এই সত্য। তিনটি বিধেয়কের মূল বৈশিষ্ট্য বা, সুর বাঁধা কয়েকটি দফায় –

এক) কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের প্রতিশ্রুতি কোথাও নেই;

দুই) মজুতদারি আর বেআইনি গণ্য হবে না;

তিন) চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, তৈলবীজ, খাদ্যযোগ্য তেল ইত্যাদি পণ্যগুলির মজুতদারি ও দামে সরকারি তরফে নিয়ন্ত্রণ হবে কেবলমাত্র যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অনন্যসাধারণ দামবৃদ্ধি এবং মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি অনন্যসাধারণ পরিস্থিতিতে;

চার) সেক্ষেত্রেও, সবজি ও ফল ইত্যাদির ক্ষেত্রে একশো শতাংশ এবং অপচনশীল কৃষিজ পণ্য অর্থাৎ, তেল, চা, চিনি ইত্যাদির ক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশ দামবৃদ্ধি ঘটলে তবেই সরকার পদক্ষেপগ্রহণ করবে;
পাঁচ) সেক্ষেত্রেও, মূল্যসংযোগশৃঙ্খলে উৎপাদনের মধ্যবর্তী স্তরে কোনও কারবার বা কারবারির উপরে সেই নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হবে না। উদাহরণ, কোনও আলুভাজা প্রস্তুতকারক সংস্থা বাজারে আলুর দাম আগুন হলেও যথেচ্ছ আলু মজুত রাখতে পারবে কিংবা, চিনির দর আকাশ ছুঁলেও চিনিকল আখ মজুত করে চলবে;
ছয়) চুক্তিচাষ হবে। চুক্তি হবে কৃষক ও বাণিজ্য সংস্থার মধ্যে। চুক্তিতে ফসলের পরিমাণ, গুণগত মান, দাম ইত্যাদি সমস্তই আগাম নির্ধারিত থাকবে;
সাত) এই চুক্তি সম্পাদিত হবে মহকুমাশাসকের কর্তৃত্বের এখতিয়ারে;
আট) এই চুক্তির উপর রাজ্যের নিজস্ব আইন বা আদেশের কোনও প্রভাব থাকবে না;
নয়) এই চুক্তি খেলাপ করার অভিযোগ উঠলে, তার বিচার দেশের দেওয়ানি আদালতে হবে না;
দশ) চুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় বিবাদের বিচার করবেন মহকুমাশাসক। তাঁর বিচারে সন্তুষ্ট না হলে আপিল করতে হবে জেলাশাসক বা অতিরিক্ত জেলাশাসকের অধীন উত্তর-বিচার কর্তৃপক্ষের (appellate authority) কাছে। এক্ষেত্রে, মহকুমাশাসক, জেলাশাসক তথা উত্তর-বিচার কর্তৃপক্ষের রায় দেশের দেওয়ানি আদালতের রায়ের সমান মান্যতা পাবে।

বিধেয়কগুলি দেশের আইনে পরিণত হলে তার প্রভাব পড়বে একাধিক। সরকারি তরফে কৃষির বাজার ও বাণিজ্যকরণের ক্ষেত্র সমস্তটাই কুক্ষিগত থাকবে কেন্দ্রসরকারের হাতে। রাজ্যের আইন এক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলতে পারবে না। দেশের আদালত তথা মূল বিচারব্যবস্থার কোনও ভূমিকা নেই। কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি প্রশাসনিক যোগাযোগ থাকবে জেলাশাসক ও মহকুমাশাসকের। রাজ্যপ্রশাসন থাকবে নীরব দর্শক। সর্বোপরি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা তথা পঞ্চায়েতেরও এখানে কোনও ভূমিকা নেই। ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, স্বেচ্ছাচার, একনায়কতন্ত্র, দলীয় ফ্যাশিজ্‌ম, কোনটা নেই এই বিধেয়কগুলির কালো অক্ষরে আঁকা অন্ধকার ছবিতে!

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের উল্লেখ তো নেই-ই, এযাবতকালের কৃষি উৎপাদন বাজার সমিতি (APMC) ব্যবস্থা অর্থাৎ কিসান মান্ডি ইত্যাদিকে একেবারে কোণঠাসা করে দেওয়া হল। বিধেয়কগুলিতে পরিষ্কার বলা আছে কৃষক ও স্পনসর অর্থাৎ, বাণিজ্যিক ক্রেতা সংস্থার মধ্যে যাবতীয় চুক্তি, লেনদেন ইত্যাদি এপিএমসি ইয়ার্ড অর্থাৎ বাজার সমিতি তথা কিসান মান্ডির

চৌহদ্দির মধ্যে হতে পারবে না এবং এসবের মধ্যে বাজার সমিতি ও মান্ডির কোনও ভূমিকা, কোনও হস্তক্ষেপ চলবে না। এর অর্থ হল, ভারতীয় কৃষক কৃষিপণ্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে বরাবর যে মূলত সামাজিক সাংগঠনিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে এসেছে এবং রাজ্যগুলি গত শতকের ষাট-সত্তরের দশক থেকে যে-ব্যবস্থাকে আরও সহায়তা দান ও সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে এবং কৃষকদের অকস্মাৎ মান্ডির বাইরে বহিরাগত বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে চুক্তিভিত্তিক চাষ করতে হবে। মান্ডি-ব্যবস্থা ও প্রস্তাবিত চুক্তিচাষের তুলনামূলক ভাল ও মন্দ আলোচিত হওয়ার আগেই, কৃষকেরা এ-বিষয়ে মতামত প্রদানের সুযোগ পাওয়ার আগেই, আইন ঘোষিত হয়ে যাবে! এ তো মানুষকে ধাক্কা দিয়ে তরঙ্গসংকুল সাগরে ফেলে দিয়ে সাঁতার শিখতে বলা! এ কি রাষ্ট্রের ঘোষিত কল্যাণমূলক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বলা হচ্ছে, এই বিধেয়কগুলি আইনে পরিণত হলে ফসল জমি থেকে বাজারে আসার পথে মধ্যবর্তী দালালতন্ত্র তথা ফড়েরাজ নির্মূল হবে। এদেরই কারণে পাঁচ টাকার ফসল খুচরো বাজারে পৌঁছনোর পর তার দাম দাঁড়ায় পঞ্চান্ন টাকা। এদের দূরে রাখতে পারলে, ফসলের যথাযোগ্য দাম পাবেন চাষী এবং বাজারে কৃষিপণ্যের দর সাধারণ ক্রেতাদের সাধ্যের মধ্যে থাকবে। বিনীত প্রত্যুত্তর, আজ্ঞে, এত সহজ নয়। খামচা মেরে খানিক তাত্ত্বিক অর্থনীতি বিতরণ করে বোকা বানানোর চেষ্টাটাই বোকামি কিংবা, ঔদ্ধত্য কিংবা, দুই-ই। যে সংস্থাগুলি চাষীর সঙ্গে চুক্তি করতে আসবে তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধিরা থাকবে, তাঁদের বেতনবাবদে ব্যয় থাকবে, বিজ্ঞাপনের ব্যয় থাকবে। চাষীকেও এমন ক্রেতার খোঁজ পেতে হবে। তাঁকেও কোনওভাবে যোগাযোগ বা বিজ্ঞাপনের দ্বারস্থ হতে হবে। নিরক্ষর, প্রায় নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত চাষীর পক্ষে তো বটেই, উচ্চশিক্ষিত কিন্তু আইনজ্ঞ নন এমন মানুষের পক্ষেও চুক্তি মুসাবিদা করা, চুক্তিতে উল্লিখিত শর্ত ও ধারাগুলি বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। সংস্থার পক্ষে যেমন, তেমনই চাষীর পক্ষেও আইনজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন হবে। ভারতে কৃষি এখনও অনেকাংশে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। খরা, বন্যা ইত্যাদির আশঙ্কা থাকেই। চাষী ও ক্রেতা সংস্থা উভয়েরই তরফে বিমা প্রয়োজন হবে। কিন্তু, আইন অনুযায়ী, যদি এই বিধেয়কগুলি আইনে পরিণত হয়, এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রাজ্যসরকার সরাসরি সহায়তা নিয়ে এক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে না। এসব বাবদে ব্যয় হবে যেমন স্পনসর তথা বাণিজ্যিক ক্রেতার, তেমনই চাষীর। এই ব্যয় নিশ্চয় ফসলের দামে যোগ হবে এবং বাজারে ফসলের দাম বাড়াবে। এরপর চুক্তিলঙ্ঘনের অভিযোগ উঠলে এবং তার বিচার চাইতে মহকুমাশাসক ও জেলাশাসকের কাছে দরবার করতে যেতে হলে, বিচারের যা নিয়ম সেই সওয়াল-জবাবের জন্য আইনজ্ঞদের সাহায্য সেখানেও লাগবে। এরপর অর্থবলে বলীয়ান বাণিজ্যিক

সংস্থা যে মহকুমা বা জেলা কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করবে না তারও নিশ্চয়তা নেই। তাহলে, মধ্যবর্তীরা কি বিলুপ্ত হল?

ভারতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাঁরা দেশের মোট চাষীদের ৮৬ শতাংশ। কিন্তু, তাঁদের মালিকানাধীন কৃষিজমি মোট কৃষিজমির ৪৭ শতাংশ। বাকি ১৪ শতাংশ চাষীদের মালিকানাধীন জমি মোট কৃষিজমির ৫৩ শতাংশ। তাহলে, এই ৮৬ শতাংশ চাষী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক, এবং দেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ, এঁরা যাবেন কোথায়? কীভাবে এত ব্যবস্থা ও ব্যয় করবেন? আইন অনুযায়ী, বিধেয়কগুলি যদি আইন হয়, কোনও অ-সরকারি ব্যক্তি বা সংস্থাও চাষীকে সাহায্য করতে পারবেন না, তাঁদের হয়ে দেশের আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে পারবেন না।

বিধেয়কগুলিতে বারংবার বলা হচ্ছে, চাষী ও ক্রেতা সংস্থার চুক্তির ভিত্তিতে যে-বিবাদই উপস্থিত হোক, কোনওক্রমেই চাষীর জমির উপরে ক্রেতা সংস্থার অধিকার জন্মাবে না। এ যেন ঠিক ‘ঠাকুরঘরে কে রে, আমি তো কলা খাইনি’ গোত্রের আগাম সাফাই। মহকুমা বা জেলা বা উত্তর-বিচার কর্তৃপক্ষের রায়ে যদি কৃষক চুক্তিভঙ্গকারী সাব্যস্ত হন, ক্রেতা সংস্থা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তির যোগ্য সাব্যস্ত হন, কৃষককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কোথা থেকে দেবেন? যদি ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির ব্যাপার না-ও হাজির হয়, বন্যা, খরা, কীটের উৎপাত কিংবা, পতঙ্গের হামলায় ফসল মাঠেই নষ্ট হয়, কৃষক কী করবেন? বিধেয়কগুলিতে এ-বিষয়ে একটি বাক্যও বলা নেই। দেনার দায়ে জমি বেচা, আত্মহত্যা, চুক্তির চাপের কারণে দুটিই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।

মনে হচ্ছে, কেন্দ্রসরকার বাজার অর্থনীতির অন্ধ উপাসক। কিন্তু, বাজার অর্থনীতি তখনই কাজ করতে পারে যখন বাজারে সার্বিকভাবে এবং বিশেষত ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাবটুকু অন্তত থাকে। তা কি আছে? ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থার মধ্যে কি দরাদরির প্রতিযোগিতা থাকা সম্ভব!

মজুতদারি ও দামবৃদ্ধি কখন নিয়ন্ত্রণের কথা সরকার ভাববে? যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অনন্যসাধারণ দামবৃদ্ধি এবং মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি অনন্যসাধারণ পরিস্থিতিতে। আজ কি সেই পরিস্থিতি নেই? স্বয়ং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী করোনার তাণ্ডবকে আখ্যা দিয়েছেন ‘দৈব দুর্বিপাক’। যাঁরা দৈব মানেন না তাঁরা এর অর্থ করবেন অনন্যসাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তা, দৈব দুর্বিপাকই হোক আর অনন্যসাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এই সময়েই এই বিধেয়কগুলি সংসদে চাবকে পাশ করিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ল!

কর্পোরেট জগৎ আঙুলে আঙুল গেঁথে চুপ করে বসে আছে। কারণ, এই বিধেয়ক আইনে পরিণত হলে তাদের লাভই লাভ। এক, এসব আইনের ফলে ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়বে এবং মুষ্টিমেয়ের জোতের গড় পরিমাণ বাড়বে। অসংখ্য ছোট চাষীর সঙ্গে চুক্তি করার চেয়ে সীমিত সংখ্যক বড় চাষীর সঙ্গে চুক্তি করায় পরিশ্রম কমে ও ব্যয়সংকোচ ঘটে, মুনাফা বাড়ে। শুধু তা-ই নয়, আইনের কোনও-না-কোনও ফাঁকে ঋণগ্রস্ত অসহায় কৃষকের জমি এই কর্পোরেট সংস্থাগুলিও কিনবে। আরও ব্যয়সংকোচ, আরও মুনাফা। সর্বোপরি, ভারতে কর্পোরেটের বিস্তার এখনও বেশি নয়। শিল্প ও সেবাক্ষেত্রের সংগঠিত একটা অংশ ছাড়া এখনও তাদের তেমন প্রভাব নেই। বিশেষত, কৃষিক্ষেত্রে কর্পোরেট এখনও বেশি দাঁত ফোটাতে পারেনি। সেই কারণেই, কাঁচা ফসল ও কৃষিজ পণ্যের বাজারের বেশিটাই এখনও তাদের ধরাছোঁওয়ার বাইরে। এই বিপুল উৎপাদন ও ব্যবসাক্ষেত্রটা তারা নিজেদের কবজায় আনতে চায়।

রাজ্যকে বাদ দিয়ে কেন্দ্র কৃষি আইন করে কোন যুক্তিতে! ভারতে কৃষি-সম্পর্কের কাঠামো, কৃষিসমাজ, কৃষি পরিকাঠামো, জমির প্রকৃতি সর্বত্র এক নয়। রাজ্য এবং বিশেষত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমণ্ডলীই সবচেয়ে ভাল বলতে পারেন স্থানিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কৃষি উন্নয়নে কী পদক্ষেপ প্রয়োজন। সংসদে বিজেপি ও তার সহযোগীদের যেমনই সংখ্যাধিক্য থাকুক, তার ভিত্তিতে কোনও যুক্তি বা কোনও আইনেই মোদি সরকার দাবি করতে পারেন না যে, ১৩৮ কোটি মানুষের দেশের প্রয়োজন সরকারপক্ষের ওই কয়েক'শো জনই ল্যাজা থেকে মুড়ো বুঝে বসে আছেন।

দেশের সর্বত্র এই বিধেয়কগুলির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশিত হচ্ছে। বেশি হচ্ছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্নাটক প্রভৃতি রাজ্যে। যেসব রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা বেশি সেখানে এই প্রতিবাদের নির্ঘোষ এখনও তুলনায় কম। এর কারণ আছে। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যের অনেক তফাত। প্রথমত, পঞ্জাব, হরিয়ানায় বড় জোতের মালিক তথা ধনী চাষীর সংখ্যা বেশি। পেপসি প্রভৃতি কোম্পানির আলুভাজা ইত্যাদি কারবার নিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতাও আছে। তাঁরা স্বাক্ষরতা, শিক্ষা ইত্যাদিতেও এগিয়ে। আসন্ন বিপদের আঁচ তাঁরা পেয়েছেন। বুঝেছেন যে, স্বাধীন চাষাবাদ ছেড়ে কর্পোরেটের মরজির অধীনতা স্বীকার করতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলিকে বোঝাতে হয়নি। বরং, তাঁদের চাপে বিজেপির সহযোগী অকালি দলের হরসিমরাত কৌর বাদল মন্ত্রিত্বই ছাড়তে বাধ্য হলেন। অর্থের কারণে এসব রাজ্যের বড়

চাষীদের কোমরের জোরও বেশি। তাঁরা কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। অন্যদিকে যেসব রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা বেশি, সেই চাষীরা ব্যাপার ভাল করে বুঝতেই পারেননি। বিপদ কিন্তু তাঁদেরই বেশি। বিধেয়কগুলি আইনে পরিণত হলে, সর্বাগ্রে তাঁরাই ভূমিহীন হবেন। পঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যের কৃষকদের তুলনায় তাঁরা অনেক বেশি বিপন্ন।

শুধু চাষী ভূমিহীন হবেন তা-ই নয়, কৃষিতে কর্পোরেটরাজ চালু হলে কর্মহীন হবেন বহু মানুষ। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে এই দালাল বা ফড়ে, এরা ঠিক কারা? জমির ফসল বাজারে আসার পথে বেশকিছু অসাধু মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী আছে ঠিকই। কিন্তু, পাশাপাশি আছেন নদীপথে ভটভটিতে, স্থলপথে লোকাল ট্রেনে, হলুদ ট্যাক্সিতে, ভ্যানোতে, ঠেলায়, স্থানীয় বাজারে দরিদ্র বিক্রেতারা – মাসি, পিসি, খুড়ো, দাদু, ভাইপো যা-ই বলুন। সবই যদি বড় বাণিজ্যিক সংস্থার আয়ত্তে গিয়ে পড়ে, তারা অনলাইন কারবার ফাঁদে, হোম ডেলিভারি দিতে শুরু করে (ইতিমধ্যে শুরু হয়েও গিয়েছে কিছুটা), এরা যাবেন কোথায়? জমির ফসল শুধু নয়, গবাদি পশু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি সমস্ত কারবারেরই এই দশা হবে। পাড়ার মুদি, খাসির দোকানি, মুরগির মাংস বিক্রেতা, ডিম বিক্রেতা সবাই বেকার হয়ে যাবেন। এদের কর্মসংস্থানের কোনও বিকল্পের সন্ধান আছে বিধেয়কগুলিতে? এদেরকেও এক ধাক্কায় উত্তাল সমুদ্রে ফেলে সাঁতার শিখতে বলা হবে। বলা বাহুল্য, বেশিরভাগই মারা পড়বেন।

১১১ নম্বর, অত্যাবশকীয় পণ্য (সংশোধনী) বিধেয়কটিতে দাবি করা হচ্ছে, “India has become surplus in most agricultural commodities”। বাকি দুটি, ১১২ এবং ১১৩ নম্বর বিধেয়কেরও ইঙ্গিত একই। তাহলে, ভারতে কৃষি উৎপাদন উদ্বৃত্ত!
তাহলে, এই দেশে এখনও সাতাশ কোটি ক্ষুধার্ত কেন? বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের নিরিখে ক্ষুধাসমস্যা সমাধানে ১১৭ দেশের মধ্যে ভারত ১০৩ নম্বর দেশ কেন? ভারতের তুলনায় এগিয়ে আছে এমনকী নেপাল, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং পাকিস্তান। চিন তো বটেই। দেশে মাথাপিছু খাদ্যশস্যপ্রাপ্তির নিরিখে ১৯৭১ সালের তুলনায় বর্তমানে কোনও অগ্রগতি ঘটেনি। বরং, ১৯৯১ সালের তুলনায় মাথাপিছু খাদ্যশস্যপ্রাপ্তি কমেছে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণ যে, সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। সাধারণ মানুষের পুষ্টির তিন-চতুর্থাংশ আসে চাল, গম, বাজরা ইত্যাদি খাদ্যশস্য ও বিভিন্ন ডাল থেকে। সেগুলি কেন্দ্রসরকারের মতে আজ আর অত্যাবশ্যক পণ্য নয়! এরা কি খবর রাখেন না যে, দেশে প্রায় ১৯ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভোগেন, সাম্প্রতিক কালে ৬৯ শতাংশ অনূর্ধ্ব-৫ শিশুর মৃত্যুর কারণ অপুষ্টি ও অনাহার! জানেন না যে, ২০১৮ সালে প্রায় ন’লাখ

অনূর্ধ্ব-৫ শিশুর মৃত্যু হয়েছে! বোঝেন না যে, করোনা-কালে এ আরও অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক!

সবই সম্ভবত জানেন ও বোঝেন। এরপরও এরা কৃষিক্ষেত্রে রোডরোলার চালাবেন। মসৃণ রাস্তা বানাবেন কর্পোরেটের আগমনের। হাতে হাত মিলিয়ে দেশ জিততে চান। ভাবতে হবে মানুষকে। ভাবাতে হবে সহনাগরিককে। জানতে হবে। জানাতে হবে। বিতর্ক হোক। হোক মতবিনিময়। তার আগে কৃষিজমির সূচ্যগ্র মেদিনী ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এঁরা সুযোধন নন। মহাভারত ভাঙিয়ে খান, কিন্তু এরা ধর্মের যুদ্ধ করেন। ধর্মযুদ্ধে এদের মতি নেই। আমরা শুনেছি, যথা ধর্ম তথা জয়। এবং, সত্যমেব জয়তে। দেখা যাক।